বর্ষ ২ সংখ্যা ২ মে ২০১৫

প্রান্তজন

ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এর মানবাধিকার ও গণতন্ত্র সনদ (ইআইডিএইচআর)-এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের আওতায় সেড প্রকাশিত বার্ষিক নিউজলেটার

সূচি

চা শিল্পে শ্রমিকের বঞ্চনা: আইন লঙ্ঘনই যেখানে নিয়ম

আমাদের অবহেলিত মানুষ

চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তার উপর ইন-ডেপথ রিপোর্টিং বিষয়ে সাংবাদিক প্রশিক্ষণ

প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

কোরাদের শেষ কজন

অনুসন্ধান: (ক) স্বাস্থ্যহানিকর অ্যাজবেসটসের ঘরে চা শ্রমিকদের বসবাস—বাড়ছে ক্যান্সারের ঝুঁকি (খ) রাজশাহীতে আদিবাসী হত্যা ও নারী নির্যাতন: নেপথ্যে ভূমি বিরোধ (গ) চা বাগানে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল: আতঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ চা শ্রমিক

“বাংলাদেশের চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তাসমূহের মানচিত্রায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি” প্রকল্পের অগ্রগতি

চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তাসমূহের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক এজেন্ডা

সম্পাদক
ফিলিপ গাইন

সম্পাদনা সহকারী
কাজী মনজিলা সুলতানা, সাবরিনা মিতি গাইন ও শানু মোস্তাফিজ

এ নিউজলেটার প্রকাশিত হয়েছে সেড পরিচালিত “বাংলাদেশের চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তাসমূহের মানচিত্রায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি” প্রকল্পের আওতায়। পার্টনার: গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র। সহযোগী সংগঠন: জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, বাগ-ানিয়া এবং মৌলভীবাজার চা জনগোষ্ঠী ফ্রন্ট।

প্রকাশক
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
১/১ পল্লবী (৫ম তলা), মিরপুর, ঢাকা-১২১৬,
ফোন: +৮৮০-২-৯০২৬৬৩৬
ই-মেইল: sehd@sehd.org, www.sehd.org

চা শিল্পে শ্রমিকের বঞ্চনা: আইন লঙ্ঘনই যেখানে নিয়ম

পূর্ণ অধিবেশনে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ও বিশিষ্ট আলোচকবৃন্দ। ছবি: ফিলিপ গাইন

কাঁচা পাতা নিয়ে ওজন ঘরের দিকে যাচ্ছেন পাতিওয়ালীরা। ছবি: ফিলিপ গাইন

চা শিল্প এমন একটি প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ যেখানে কেবল জাতীয় পর্যায়ে শ্রমিকসংঘ বা ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে। এবং একটি শ্রমিকসংঘ করবার জন্য মোট শ্রমিকের ৩০ শতাংশকে তার সদস্য হতে হবে। চা শিল্পে শ্রমিক নিয়োগপত্র পায় না। চা বাগানের মধ্যে লেবার লাইনে আবদ্ধ চা শ্রমিক অবসরের পরেও তার ঘরে থাকবার বিনিময়ে গ্রাচুইটি সমর্পণ করে নিঃশব্দে। চা শিল্পে শ্রমিকের কোনও নৈমিত্তিক ছুটি নেই। এরকম আরো অনেক অন্যায়-অনিয়মের সাথেই চা শ্রমিকরা বসবাস করছে বংশ পরম্পরায়।

চা শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন (শ্রমিকসংঘ) নেতা ও কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সোসাইটি ফর এনভায়রমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) আয়োজিত এক কর্মশালায় আলোচক ও অংশগ্রহণকারীদের আলোচনায় এসব বিষয় ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রসঙ্গে আরো নানান অনুষঙ্গ স্থান পায়। ১১ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪ মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জে আবাসিক কর্মশালাটির আয়োজন করা হয়। অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা, ইউনিয়নের পঞ্চায়েত পর্যায়ের নেতা, জাতীয় শ্রমিক ইউনিয়নের কিছু নেতা এবং বাংলাদেশ টি এস্টেট স্টাফ এসোসিয়েশনের একজন নেতা। চা উৎপাদনকারী সমস্ত ভ্যালি ও জেলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন এসব অংশ-গ্রহণকারী। প্রশিক্ষক ছিলেন সেডের কর্মকর্তা, ট্রেড ইউনিয়নের নেতা, শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করেন এমন গবেষক ও সংগঠক।

কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য চা শ্রমিকদের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে জ্ঞান ও চিন্তার আদান-প্রদান, দক্ষতা বিনিময় ও যোগাযোগের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চা শিল্পে শ্রমিক নেতাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সাথে চা শ্রমিক ইউনিয়নকে যুক্ত করা।

কর্মশালায় শ্রম আইন অনুসারে চা শ্রমিকের অধিকার, চা শ্রমিকের প্রতি বৈষম্য ও চা শিল্পে শ্রম আইনের লংঘন বিষয়ে আলোচনা করেন আলোচকরা। চট্টগ্রাম ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি ও চট্টগ্রাম শ্রম আদালতের সদস্য তপন দত্ত বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ১৮৩ নং ধারার উল্লেখ করে বলেন, “এই ধারাটি একটি কালাকানুন ও আইএলও কনভেশন ৮৭-এর সাথে সাংঘর্ষিক। এই ধারাটি শ্রমিকদেরকে কেবল জাতীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন করার অধিকার দিয়েছে এবং একটি ইউনিয়ন করবার জন্য গোটা চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের ৩০ শতাংশকে সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক করেছে।”

চা শিল্প এমন একটি প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ যেখানে কেবল জাতীয় পর্যায়ে শ্রমিকসংঘ বা ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে। চা শিল্পে শ্রমিক নিয়োগপত্র পায় না। চা শিল্পে শ্রমিকের কোনও নৈমিত্তিক ছুটি নেই।

এ প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে দি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইকো কোঅপারেশন। এ প্রকাশনায় যেসব দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে তা আবশ্যিকভাবে দি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইকো কোঅপারেশন-এর নয়।

রাজঘাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও চা শ্রমিক নেতা বিজয় বুনার্জি বলেন, “একের অধিক ইউনিয়ন হলে ভালো হয়, যার মাধ্যমে শ্রমিক নেতারা শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে প্রতিযোগিতামূলক ভূমিকা রাখতে পারে এবং এতে নতুন নেতৃত্ব তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়।”

চা শিল্পে শ্রমিক নিয়োগের সাধারণ শর্তাবলীই পূরণ করা হয় না। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপ-মহা পরিদর্শক মো: আজিজুল ইসলাম বলেন “শ্রমিক নিয়োগের প্রথম শর্তই হচ্ছে শ্রমিককে নিয়োগপত্র প্রদান করা এবং নিয়োগপত্রে চাকুরির সকল শর্তাবলী (অবশ্যই শ্রম আইন থেকে বেশি হতে পারবে কিন্তু কম নয়) উল্লেখ থাকা।” শ্রমিকদের কতকগুলি মৌলিক অধিকার তার আলোচনায় উঠে আসে, যেমন, নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, সার্ভিস বই, শ্রমিক রেজিস্টার, আইন অনুযায়ী মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ছেদ, ছুটি, ন্যায্য ভাতা ও মজুরি, শিক্ষা, বাসস্থান, বিনোদন ইত্যাদি। এই অধিকার না দেওয়া মালিকের জন্য ফৌজদারী অপরাধ বলেও উল্লেখ করেন তিনি। সরকারি পরিদর্শক হিসাবে দায়িত্ব পালনে তাদের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে তিনি বলেন, “শক্তিশালী মালিক পক্ষ, জটিল আমলাতন্ত্র ও দুর্বল আইনের কারণে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারিনা আমরা।”

চা শ্রমিকদের নিজস্ব কোনো ভূমি বা বাসস্থান নেই। আইন মোতাবেক অবসরের পর সে বাগানের লেবার লাইনেও থাকতে পারবে না। সলিডারিটি সেন্টারের সিনিয়র লিগ্যাল কাউন্সিলর এ্যাডভোকেট এ কে এম নাসিম বলেন, “চা বাগান মালিকেরা অবসরপ্রাপ্ত চা শ্রমিকদের সন্তানকে চাকুরি দেয়া ও তাকে বাগানে থাকতে দেয়ার লোভ দেখিয়ে গ্রাচুইটি বা সার্ভিস বেনিফিট আত্মসাৎ করে।” অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকের পোষ্যকে চাকুরি দেয়ার শর্তে তাদেরকে লেবার লাইনে থাকতে দেয়াকে জবরদস্তিমূলক শ্রম ও শ্রম আইনের লঙ্ঘন বলে মন্তব্য করেন কর্মশালার আলোচকরা।

চা শিল্প শ্রমিকেরা সাপ্তাহিক ছুটি ও নৈমিত্তিক ছুটি পায় না। মো: আজিজুল ইসলাম বলেন, “সরকার আইন করে চা শ্রমিকদের নৈমিত্তিক ছুটি বাতিল করেছে।” মালিকপক্ষ এই আইনকে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে।

এ্যাডভোকেট নাসিম শ্রম আইন নিয়ে প্রশ্ন তুলেন, “কেন চা শ্রমিকেরা বাৎসরিক ১০ দিন নৈমিত্তিক ছুটি পাবে না?”

শ্রম দপ্তরের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন দুঃখ করে বলেন, “চা শ্রমিকেরা চা বাগানের লেবার লাইনে বংশাণুক্রমে আবদ্ধ যা রীতিমত দাসত্বের জীবন।” চা শ্রমিকের মজুরি নিয়ে গিয়াস উদ্দিন মন্তব্য করেন, “চা শ্রমিকের মজুরি সত্যিকার অর্থে শোচনীয়।” তিনি চা শ্রমিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য শক্তিশালী শ্রমিক সংঘের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে বলেন, “চা শ্রমিকের মজুরি যৌক্তিক হওয়া উচিত। একই শ্রমিক চা বাগানের বাইরে কাজ করলে দিনে একবেলা খাবারসহ ২৫০-৩০০ টাকা পায় কিন্তু চা বাগানে কেন মাত্র ৬৯ টাকা পাবে? বর্তমান বাজার মূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে চা শ্রমিকদের মজুরি পুনর্নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে একমাত্র শক্তিশালী শ্রমিক সংঘ।”

কর্মশালায় শ্রমিক সংঘকে শক্তিশালী করার একটা অন্যতম উপায় হিসেবে এই সংঘকে অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের সাথে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন বক্তারা। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-এর সহকারী নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, “চা শ্রমিক সংঘকে অবশ্যই এর কাছাকাছি (সমমনা) যত শ্রমিক সংঘ আছে সেগুলোর সাথে যোগাযোগ বা সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।” শ্রমিক আন্দোলনে নানান ধরনের প্রতিকূলতার কথা বর্ণনা করে সুলতান উদ্দিন বলেন, “আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের সাথে আমাদের জাতীয় শ্রমিক সংঘের সম্পর্ক স্থাপনকে রাজনীতিবিদেরা ষড়যন্ত্র হিসাবে দেখে, কিন্তু এটা শ্রমিকের আইনগত অধিকার। যেটা মালিকপক্ষ ও সরকারের জন্য ষড়যন্ত্র সেটা শ্রমিকের জন্য ‘ঐক্য ও সংহতি’।”

চা শ্রমিক ও শ্রমিকসংঘের দক্ষতা বিনিময় ও যোগাযোগের সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে একটি অধিবেশন পরিচালনা করেন। ড. পাণ্ডে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, সংবাদ সম্মেলন ও সংবাদ লেখার কলা-কৌশল নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি এসব বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে বলেন, “চা বাগান ও এর শ্রমিকদের কী কী সমস্যা আছে সেসব প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে জাতির সামনে আনতে হবে এবং এটা করতে হবে শ্রমিকদেরকেই।”

চারদিনব্যাপী এই আবাসিক কর্মশালার একদিন নির্ধারিত ছিল মাঠ কর্মশালার জন্য। মাঠ কর্মশালার মাধ্যমে চা শ্রমিকদের যে সকল সমস্যা ও প্রয়োজন বের হয়ে আসে তার মধ্যে অন্যতম খারাপ পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত ও প্রয়োজনীয় বাসস্থানের অভাব, মানসম্মত শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষিতদের চাকুরির অভাব, জেন্ডার বৈষম্য, নিরাপদ কর্মস্থলের অভাব, সুচিকিৎসার অভাব এবং সর্বোপরি স্বল্প মজুরি। অর্থনৈতিক দুরবস্থাই চা শ্রমিকদের দুর্দশার মূল কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়।

কর্মশালার মূল্যায়ন পর্বে অংশগ্রহণকারীরা বলেন চা শ্রমিকদের দুর্দশা থেকে উত্তরণের জন্য কর্মশালাটি চা শ্রমিক, নেতা ও সংঘের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির এক গভীর জ্ঞান ও অনুভূতির সঞ্চার করেছে। বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রামভজন কৈরি চা শ্রমিক সংঘের নেতাদের জন্য এই ধরনের একাধিক কর্মশালার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, “শ্রমিক নেতাদের জন্য একটি মাত্র কর্মশালাই পর্যাপ্ত নয়। তবে এটা আমাদের সিঁড়ির পথ দেখিয়ে সিঁড়িতে উঠা শিখিয়ে দিলো। এখন বাকী পথ আমাদের নিজেদের চলতে হবে।” এ ধরনের উদ্যোগ আরো গ্রহণ করা হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ❑

ফিলিপ গাইনের সাথে আবদুল্লাহ আল মাহ্দী

আমাদের অবহেলিত মানুষ

জাতিবৈচিত্র্য এবং বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আদিবাসী ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী নিয়ে গর্ব করতে পারে এবং গর্ব করা উচিত। কিন্তু সম্প্রতি ‘বাঙালি’ জাতীয়তাবাদে ফিরে গিয়ে রাষ্ট্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহকে তাদের পরিচয়ের স্বীকৃতি এবং রাজনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার ব্যাপারে অবিচার করেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের ‘স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তা ও জনগোষ্ঠীর মানচিত্র, পরিচয় ও অধিকার নিয়ে পুনর্ভাবনা’ শীর্ষক সংলাপে বক্তারা এমনই

সংলাপে অংশগ্রহণকারীরা।

বলেছেন।

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভলপমেন্ট (সেড), উত্তরবঙ্গ ভিত্তিক আদিবাসী প্রতিষ্ঠান জাতীয় আদিবাসী পরিষদ এবং গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে) ১৯ এপ্রিল ২০১৫ দিনাজপুরে এই সংলাপের আয়োজন করে। সংলাপে ৩৫টি জাতিসত্তার প্রতিনিধিত্বকারী শতাধিক ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে ছিলেন মানবাধিকার কর্মী, বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতা, সুশীল সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, সরকারি প্রতিনিধি এবং সাংবাদিক।

রাষ্ট্র সম্প্রতি যে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০' প্রণয়ন করেছে তাতে বাংলাদেশের ২৭টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তবে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা নিয়ে সেড-এর সাম্প্রতিক গবেষণা ও বিভিন্ন গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তের সারসংক্ষেপ উপস্থাপনা করে ফিলিপ গাইন বলেন, বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল এবং চা বাগানগুলোতে ৫০টিরও বেশি স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তার অস্তিত্ব রয়েছে, যারা সাংবিধানিক ও পরিসংখ্যানগতভাবে বিচ্ছিন্ন, অদৃশ্য এবং অস্বীকৃত।

"এই জাতিসত্তাসমূহের মানুষেরা চরমভাবে বঞ্চনার শিকার। তাদের জীবনে পরিবর্তন আনতে হলে রাষ্ট্র ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে তাদের দুঃখ-বেদনা ও বঞ্চনা অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হবে," বলেন দিনাজপুরের ওঁরাও বুদ্ধিজীবি লুকাস কিসপট্টা। "এই জাতিসত্তাসমূহের মানুষেরা তাদের বিষয়ে রাষ্ট্রের কাছে বিশেষ মনোযোগ প্রত্যাশা করে। কেননা তারা আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যপক বৈচিত্র্য এনেছেন। এসব জাতিসত্তার মানুষের সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে সঠিক নীতি কৌশল গ্রহণ করতে হবে।"

লুকাস কিসপট্টা যে বঞ্চনার কথা বলেছেন তার জোরালো প্রতিধ্বনি শোনা যায় রাজশাহী থেকে আগত ওঁরাও নারী বিচিত্রা তিরকির (৩৪) কণ্ঠে। কীভাবে তিনি তার বাঙালি প্রতিবেশিদের দ্বারা নিপীড়নের শিকার হন তার বর্ণনা দেন।

"আমরা আদিবাসীরা অবিরাম নিপীড়নের শিকার। কিন্তু রাষ্ট্র আমাদের রক্ষা করে না," বিচিত্রা অভিযোগ করে বলেন। "বর্তমানে আমাদের সমস্যা হলো আমাদের জমি দখল করে নেয়া। ভূমির জন্য আমরা প্রতিনিয়ত অনেক বড় বড় ঝামেলা মোকাবেলা করছি। ভূমিদস্যুরা মিথ্যা মামলা দিয়ে আমাদের জীবন অস্থির করে তুলছে। এ নিয়ে আমরা আদালতে গেলে দ্রুত এবং ন্যায়বিচার কোনোটাই পাই না।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. তানজিমুদ্দিন খান এসব জাতিসত্তার প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির মানসিকতা এবং তাদের সাথে রুঢ় আচরণ যে এদেশে বহুল প্রচলিত তা মনে করিয়ে দেন। তিনি বলেন, "তাদের প্রতি রাষ্ট্রের এই দুর্বৃত্তায়ন কোনোভাবেই মানবিক নয়। রাষ্ট্র আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ক আই-এলও কনভেনশন ১৬৯ অনুসাক্ষর করেনি, যা রাষ্ট্রকাঠামোর অমানবিকতারই প্রতিচ্ছবি।"

এটা শুধু ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের বিশেষ করে স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তাসমূহের জমি সম্পর্কিত কিংবা কোনো সামাজিক বিষয় নয়, এর সাথে তাদের ভাষা এবং সংস্কৃতির বিষয়টিও গভীরভাবে জড়িত। বাংলা ছাড়াও বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের মানুষরা ৩৭টি ভাষায় কথা বলে (বিচারপতি হাবিবুর রহমানের 'বাংলাদেশের নাম ভাষা' বই অনুসারে)। সঠিক শুমারি হলে এই সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। এমনও জাতিসত্তা আছে যারা তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে না, আবার এমনও জাতিসত্তা আছে যারা নিজস্ব ভাষায় কথা বললেও তাদের কোনো বর্ণমালা নেই। "এসব জাতিসত্তার মানুষদের ভাষা হুমকির মুখে এবং তা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। তাদের বর্ণমালার উৎকর্ষ সাধন এবং সংরক্ষণ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ," বলেন দিনাজপুরের এডিসি জেনারেল আবু রায়হান মিয়া। "কীভাবে তাদের ভাষাকে রক্ষা করতে হবে এ বিষয়ে আদিবাসী তরুণদের প্রশিক্ষণ নেয়া প্রয়োজন। কেননা এখন তারা সেসব ভাষায় কথা বলতে পারলেও ভবিষ্যতে সেগুলো হারিয়ে যেতে পারে।"

"আদিবাসীরা দিন দিন তাদের ঐতিহ্য, জ্ঞান, উৎসব এবং গর্বের জিনিসগুলো হারিয়ে ফেলছে। এটা শুধু আদিবাসীদের ক্ষতি না, এটা আমাদের দেশেরও ক্ষতি," বলেন দিনাজপুর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের পরিচালক মোয়াজ্জেম হোসেন।

আদিবাসীদের ভূমি সমস্যার অবসান কীভাবে সম্ভব

সংলাপের অধিকাংশ সময় জুড়ে আদিবাসীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি বক্তারা সমস্যাগুলোর সমাধান নিয়েও আলোচনা করেন। প্রথম আলোর দিনাজপুর প্রতিনিধি আবদুল্লাহ সরকার আদিবাসী বিষয়ে বিভিন্ন সময় প্রতিবেদন করেছেন। তিনি বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও, বিভিন্ন চার্চ সংগঠন এবং বিভিন্ন আদিবাসী প্রতিষ্ঠানের প্রতি আদিবাসীদের জমির দলিলপত্র নিষ্কণ্টক করার আহবান জানান, "আদিবাসীদের উচ্ছেদ ও নির্যাতনের একটি বড় কারণ তাদের জমির দলিল ও কাগজপত্র হালনাগাদ নয়।"

আবদুল্লাহ সরকারের সাথে একমত পোষণ করেন এডিসি জেনারেল আবু রায়হান। "ভূমি সমস্যার সমাধান তখনই হতে পারে যখন আপনি সঠিকভাবে জানবেন আপনার নামে কতটুকু জমি আছে, এর সীমানা সম্পর্কে আপনার পরিষ্কার ধারণা থাকবে, সেটা রেকর্ডে আছে কীনা, সেটার খারিজ নাম হয়েছে কীনা তা দেখতে হবে এবং তারপর স্বত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে" বলেন রায়হান। "আদিবাসীদেরও এ দেশের অন্যান্য নাগরিকের মত একই অধিকার আছে। আপনাদের চারপাশে দুর্বৃত্তরা ঘোরাফেরা করে এবং এ বিষয়ে আপনাদের সতর্ক থাকতে হবে।"

জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি এবং সংলাপের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আদিবাসী নারীদের সংগ্রাম এবং তাদের ভূমিকাকে প্রসংশা করে বলেন, "একদিকে আদিবাসী নারীরা নিপীড়ন মোকাবেলা করছে, অন্যদিকে তারা অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সামনের সারিতে রয়েছেন।"❑ *ফিলিপ গাইন*

চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তার উপর ইন-ডেপথ রিপোর্টিং বিষয়ে সাংবাদিক প্রশিক্ষণ

দৃশ্যমান নয় এমন এবং স্বল্প-পরিচিত জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বিশ্বাস করে গণমাধ্যমগুলো ভাল প্রতিবেদন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে তাদেরকে সামনে নিয়ে আসতে পারে।

এসব জাতিগোষ্ঠীর প্রতি গণমাধ্যমের মনোযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) ১৭-২০ অক্টোবর ২০১৪ মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে চার দিনের এক আবাসিক কর্মশালায় সাংবাদিক, গবেষক ও মানবাধিকার কর্মীদের একত্রিত করে। "চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তাসমূহের উপর ইন-ডেপথ রিপোর্টিং-এ দক্ষতা বৃদ্ধি" শিরোনামে এ কর্মশালায় ২৬ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর-মধ্যাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে আগত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ১৭ জন সাংবাদিক যোগ দেন।

কর্মশালাটির মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশে বসবাসকারী চা জনগোষ্ঠী ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তাসমূহের অধিকার ও সামাজিক ন্যায় বিচার বিষয়ে সাংবাদিকদের সম্পৃক্ত করা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে প্রতিবেদন তৈরিতে তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রামভজন কৈরী বলেন, "চা শ্রমিকদের মানবাধিকারের বিষয়গুলো দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত। পেশাগত দক্ষতার মাধ্যমে এই বিষয়গুলো তুলে ধরা এবং জাতীয় আলোচ্যসূচিতে এদের সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের দায়িত্ব রয়েছে।"

কৈরী মুদ্রণ ও সম্প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপনে চা শ্রমিকদের হাস্যজ্জল ছবি প্রদর্শনের সমালোচনা করে বলেন, এর মাধ্যমে চা শ্রমিকদের দুর্দশার চিত্র আড়াল করা হয়।

শ্রীমঙ্গল উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান রণধির কুমার দেব বলেন, "যারা (চা শ্রমিকরা) আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন তাদের পক্ষে কাজ না করে আমাকে বাগান মালিকদের পক্ষে অবস্থান নিতে হয়। বাগানে মালিক-শ্রমিক বিবাদে শক্তিশালী মালিকপক্ষ দ্বারাই আমরা বেশি প্রভাবিত হই।"

অংশগ্রহণকারীরা (চা শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, আদিবাসী নেতা এবং গবেষক) সকলেই এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় চা সম্প্রদায় ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তার নানা বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মত-ামত তুলে ধরেন।

দেশের ১৫৭ টি চা বাগান সরকারের কাছ থেকে বরাদ্দ নেয়া প্রায় এক লাখ ১৪ হাজার হেক্টর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। চা চাষের জন্য বরাদ্দ দেয়া জমির ব্যবহার প্রসঙ্গে প্রকাশ কান্তি চৌধুরী (এডিসি, রাজস্ব, মৌলভীবাজার) বলেন, "মালিকদের সাথে সরকারের জমি নিয়ে চুক্তিতে চা শ্রমিকদের অধিকার বিষয়ে কোনো কথা নেই। ফলে মালিকরা শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় ভাবলেশহীন।"

তিনি আরো বলেন, "চা বাগানে কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে শতকরা ৪০-৪৫ জন বেকার। এ সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে বিকল্প কাজ খোঁজা খুবই জরুরি।" বাগানের বাইরে চা জনগোষ্ঠীর চাকরির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "বাগানের বাইরে চাকরির সুবিধার্থে পৃথক জাতিসত্তা হিসেবে চা জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির লক্ষ্যে বাগানে বসবাসকারী ৪০ টি জাতিসত্তার মানুষের একটি তালিকা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে যাচাই বাছাইয়ের জন্য আমরা পাঠিয়েছি।"

বাংলাদেশ চা বোর্ড-এর প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (পিডিইউ)-এর পরিচালক মো: হারুন-অর-রশীদ বলেন,"শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়টি দেখার দায়িত্ব বাগান মালিকের। শ্রমিক ইউনিয়ন এ বিষয়ে দর কষাকষির পক্ষ হিসেবে কাজ করবে। এক্ষেত্রে সরকারের

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য।" পিডিইউ পরিচালকের বক্তব্যের বিরোধিতা করে চা শ্রমিক নেতা বিজয় বুনার্জি বলেন, "শ্রমিক ইউনিয়নের পাশাপাশি সরকারেরও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখা উচিত।"

রাজশাহীর সাংবাদিক এস এম আতিক বলেন, "যখন কোনো আদিবাসী হত্যা বা ধর্ষণের ঘটনা ঘটে শুধুমাত্র তখনই আমাদের রিপোর্ট করতে পাঠানো হয়। কিন্তু স্বল্প-পরিচিত এসব জাতিসত্ত-ার গুরুত্বপূর্ণ আরো অনেক বিষয়ে অনুসন্ধানের সুযোগ যে রয়েছে তা এই কর্মশালায় না আসলে বুঝতে পারতাম না।"

দিনাজপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক চিত্ত ঘোষ বলেন, "চা বাগানের শ্রমিকরা দেশের অন্য যে কোনো শ্রমিকের চেয়ে মালিকদের কাছে বেশি জিম্মি।"

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা চা জনগোষ্ঠী ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তার অধিকার বিষয়ে আরো বেশি মনোযোগের মাধ্যমে ইন-ডেপথ প্রতিবেদন তৈরি ও লেখালেখি চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন। ❑

মো: রাজিবুল হাসান ও মো: লোকমান হোসেন

প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বাংলাদেশের আদিবাসী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও চা জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করে দেশের নানা বেসরকারি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও গোষ্ঠীর মানুষের নিজেদেরও আছে নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অধিকার আদায়ের জন্য নিবেদিত প্রতিষ্ঠান। তবে এসব প্রতিষ্ঠানের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো এদের অধিকাংশের কোনো রেজিস্ট্রেশন নেই, নেই লোকবল ও আর্থিক সঙ্গতি। রেজিস্ট্রেশন ও আর্থিক সঙ্গতিহীন এসব প্রতিষ্ঠানকে দক্ষ ও সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) ও দিনাজপুর ভিত্তিক সংগঠন গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে) দিনাজপুরের পার্বতীপুরে গত ১৬-১৮ এপ্রিল ২০১৫ আয়োজন করে একটি কর্মশালা।

দিনাজপুরের কর্মশালাটি "বাংলাদেশের চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মানচিত্রায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক তিন বছর মেয়াদী প্রকল্পের অংশ।

দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর-মধ্যাঞ্চল ও চা বাগান এলাকায় চা জনগোষ্ঠী ও আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্বকারী ১৬টি প্রতিষ্ঠানের পাঁচজন নারীসহ মোট ২২ জন প্রতিনিধি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় সিভিল সোসাইটি ও কমিউনিটি-বেসড প্রতিষ্ঠান সমূহের বর্তমান পরিস্থিতি, তাদের চ্যালেঞ্জ ও তা মোকাবেলার উপায় এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা গুরুত্ব পায়।

অধিবেশনের সঞ্চালক ফিলিপ গাইন বলেন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে এসব প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট অবদান থাকলেও প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য আইনি কাঠামো, তথ্য সংগ্রহ ও সেসবের ব্যবহার, মনিটরিং ইত্যাদি বিষয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সক্ষমতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

কর্মশালার দ্বিতীয় দিনের শুরুতে চা জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে চা শ্রমিক ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি রামভজন কৈরী চা শ্রমিকদের চিত্র তুলে ধরে বলেন, "চা বাগানে শ্রমিকরা মানবেতর জীবন যাপন করছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা রাষ্ট্রের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। শ্রমিকদের নানা সমস্যা গণমাধ্যমসহ নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে ও দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য শ্রমিকদের দক্ষতা অর্জন জরুরি।"

আদিবাসী ও চা শ্রমিকদের মাঝে কর্মরত প্রতিষ্ঠানসমূহের চ্যালেঞ্জ: সিভিল সোসাইটি (সিএসও) ও কমিউনিটি-বেজড অরগানাইজেশন (সিবিওস) সমূহের অবস্থা, চ্যালেঞ্জ ও প্রয়োজন নিয়ে দ্বিতীয় দিনের মূল অধিবেশন শুরু হয়।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ।

অংশগ্রহণকারীগণ তৃণমূল পর্যায়ে কাজের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের বাধা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করেন। এসব প্রতিবন্ধকতার অন্যতম আইনি কাঠামোর অভাব (অংশগ্রহণকারীরা যে ১৬টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করেন তার মাত্র ৫টি প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশন রয়েছে এবং কোনো প্রতিষ্ঠানেরই এনজিও ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন নেই); দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো; সাংগঠনিক শক্তি ও সামর্থ্য তৈরিতে দক্ষ জনবলের অভাব; ভৌগলিক অবস্থান (প্রত্যন্ত এলাকায় প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করে); অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগহীনতা (গণমাধ্যম এবং প্রশাসনসহ); কর্মপরিকল্পনার অভাব; সংগঠনের বিশ্বাসযোগ্যতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতার অভাব; সাংগঠনিক পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণের অভাব; ঐক্যমতের অভাব; রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সুরক্ষার অভাব; প্রতিবেদন তৈরিতে দক্ষতার অভাব; আদিবাসী ও স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসাবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি না থাকা; গবেষণা এবং তথ্যানুসন্ধানে দক্ষতার অভাব; আর্থিক অসঙ্গতি; আদিবাসীদের অধিকার ও সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট আইএলও সনদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকা; কার্যকরী লবি এবং এডভোকেসির ক্ষেত্রে সক্ষমতার অভাব; সুশাসনের অভাব; প্রতিষ্ঠানের টেকসই না হওয়া; প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহকে মূলধারার সাথে যুক্ত করতে না পারা; সরকারি বিভিন্ন নীতি-কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞতা; এবং শ্রমিক সংঘ, চা জনগোষ্ঠি, আদিবাসী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহের পাঠ এবং যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষমতার অভাব।

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়: অংশগ্রহণকারীগণ দলগত আলোচনার ভিত্তিতে এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার উপায় চিহ্নিত করেন। এসবের মধ্যে অন্যতম যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রিকরণ; গঠণতন্ত্র সময় উপযোগী করা ও তার চর্চা; তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার; গবেষণা, প্রকাশনা ও ডকুমেন্টেশনের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা; গবেষণা এবং প্রকাশনা; প্রথাগত জ্ঞান, ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক উপাদান সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ; বঞ্চনা ও নির্যাতনের উপর প্রকাশনা বের করা; আদিবাসী ও চা জনগোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন এবং আইন বিষয়ে আদিবাসী ও চা জনগোষ্ঠীর সংগঠনসমূহকে অরিয়েন্টেশন দেওয়া; আইন সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা; বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ; প্রকাশনা ও প্রচারণার ব্যবস্থা করা; চা জনগোষ্ঠী ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তামূহের প্রতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা; সরকারি, বেসরকারি ও দাতা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো; এবং প্রকল্প তৈরি ও তহবিল গঠণ এবং প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের চাঁদা এবং জনপ্রতিনিধিদের অনুদান গ্রহণ করে তহবিল গঠণ করা বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিয়ে আলোচনা করেন জিবিকে'র প্রোগ্রাম হেড ভূপেশ রায়। তিনি প্রতিষ্ঠানের গঠণতন্ত্র, এর কার্যকারিতা ও গঠণতন্ত্র তৈরির পদ্ধতি এবং ধাপসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

কর্মশালা'র শেষদিন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন প্রিপ ট্রাস্ট-এর অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান আহসান আলী। তিনি একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা'র বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ দেন।

সক্ষমতা বৃদ্ধির টুলবক্স (ম্যানুয়াল) প্রণয়ন: এক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে আসে এবং অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তার একটি সূচিপত্র তৈরি করা হয়।

কর্মশালার শেষ দিনে আলোচনা করেন জিবিকে'র প্রধান নির্বাহী মোয়াজ্জেম হোসেন। অধিকার আদায়ের এবং সংস্কৃতি রক্ষার জন্য আদিবাসীদের নিজেদের সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। ❑

কোরাদের শেষ কজন

কোরা নারী। ছবি: ফিলিপ গাইন

থোপাং কোরা। বয়স ৭০। কোরাদের গ্রামের সবচেয়ে অভিজ্ঞ শিকারি। পেশায় একজন রিকশাচালক। সারাদিনের খাটুনি শেষে ঘরের পাশের জায়গাটিতে রিকশা রাখার পর কথা হয় তার সাথে।

১৯৭১ সালে বাঙালিদের সাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার এই মানুষটি। এখন কোনওমতে একবেলা খেয়ে আর ছোট্ট কুড়ে ঘরের বারান্দায় ঘুমিয়ে দিন চলে তার। এতই ছোট তার ঘরটি যে পরিবারের অন্য সদস্যরা রাতে শোবার পর সেখানে তার জন্য আর জায়গা হয়না। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে দেশের সমতল জায়গাগুলোতে বসবাসরত কোরাদের জীবন কাটছে এভাবেই।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর একটি কোরা। দিনাজপুর জেলার ভারত সীমান্তবর্তী তিনটি গ্রামে মাত্র ৯৬ জন কোরার বসবাস। এক সময় এই অঞ্চলে শতবছর ধরে বাস করেছে অনেক কোরা পরিবার। বিরল উপজেলার ১৫০ একর জমির মালিক ছিল তারা। সময়ের সাথে সাথে, স্থানীয় বাঙালিদের চাপে দেশান্তরী হয়ে ভারতের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে অনেকেই। জমির বৈধ মালিকানা আর বাইরের জগতে পরিচিত না থাকায় লোভী ভূমি দখলকারীদের সাথে লড়াইয়ে পেরে ওঠেনি তারা। আদিবাসী আর ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর ভূমির মালিকানা রক্ষা করতে সরকারের ব্যর্থতা সংঘাত সৃষ্টি করেছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন আর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কোরা অন্যতম। প্রতিবেশি বাঙালিদের উৎপাতে এদের অনেকেই দেশ ছেড়েছে।

এখনো নিজের বাড়ি ছেড়ে যায়নি যেসব পরিবার, তাদের জীবন কাটছে ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের মাঝে। এদের বেশিরভাগই দিনমজুর হিসেবে কাজ করেন প্রতিবেশি বাঙালিদের জমিতে, যে জমি একসময় তাদেরই ছিল।

মাত্র তিনটি কোরা পরিবার ছয় একর জমির মালিক, বাকি সবার মালিকানাধীন জমির পরিমাণ এক একরেরও কম। আর এই ক্ষুদ্র জমিও তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করছে স্থানীয় ভূমি দস্যুরা। কোরাদের এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত আছেন অনেক সরকারি কর্মকর্তাও। কোরাদের জমি কেড়ে নিতে এই ভূমি দস্যুরা আশ্রয় নেয় হুমকি আর মামলার। কোরাদের ভূমি অধিকার নিয়ে অহিংস আন্দোলনকারীদের একজন কীনা কোরা বলেন, "তারা আমার পায়ের রগ কেটে দেয়ার হুমকি দিয়েছিল।" এই আন্দোলনে অংশ নেয় অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এমনকি অনেক স্থানীয় বাঙালিও। কোরাদের রক্ষায় রাষ্ট্র যদি ব্যর্থ হয়, তবে ক্ষুদ্র এই জনগোষ্ঠীর শেষ কজনও হয়ত বাধ্য হবে দেশ ছাড়তে।❑
২০১৪ সালের ১২ ডিসেম্বর সাপ্তাহিক ট্রিবিউন-এ প্রকাশিত "দ্য লাস্ট অব কোরাস" থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ।

অনুসন্ধান

স্বাস্থ্যহানিকর অ্যাজবেসটসের ঘরে চা শ্রমিকদের বসবাস—বাড়ছে ক্যান্সারের ঝুঁকি

দীর্ঘদিন অ্যাজবেসটসের সংস্পর্শ থাকলে ফুস-ফুস ও শ্বাসনালিতে ক্যান্সারের ঝুঁকি থাকে। স্বাস্থ্যগত দিক বিবেচনায় এরই মধ্যে বিভিন্ন দেশে অ্যাজবেসটস ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশের শহরগুলো এমনকি গ্রামেও এখন আর অ্যাজবেসটস ব্যবহার হয় না। কিন্তু চা বাগানগুলোয় এখনো রয়ে গেছে তা। এতে শ্রমিকদের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ছে।

জানা গেছে, অ্যাজবেসটসের ছাউনিযুক্ত ঘরে বসবাসকারী চা শ্রমিকদের অনেকেই ক্যান্সারে মারা গেছেন। গত বাংলা বর্ষের চৈত্রে ক্যান্সারে মারা যান শ্রীমঙ্গলের দলই চা বাগানের শ্রমিক হরদেব পাশি (৬৫)। তার এক মাস পর মারা যান রামচন্দ্র শুক্লা (৫৫)। এখন থেকে দেড় বছর আগে মারা যান সামদেও ভর (৬০)। দলই চা বাগানে বড় লেবার লাইনের প্রতিবেশি ছিলেন এ তিন শ্রমিক। প্রত্যেকের বাড়িতেই রয়েছে অ্যাজবেসটসের ছাউনি।

সামদেও ভরের স্ত্রী হেমন্তী ভর বলেন, তার স্বামীর বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট ছিল। দুই সপ্তাহ বিছানায় থাকার পর সিলেটের ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন। চিকিৎসক বলেছেন ক্যান্সার ছিল। সেই থেকে এ বাগানে ১০ জনের মতো শ্রমিক ক্যান্সারে মারা গেছেন। এ লাইনেই (বড় লাইন) মারা গেছেন ছয়জন যাদের সবার ঘরের চালা ছিল অ্যাজবেসটসের। তবে অ্যাজবেসটস যে ক্যান্সারের জন্য দায়ী, এমন কথা জানেন না তিনি।

অ্যাজবেসটসের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. খালেদা ইসলাম বলেন, এটা আশঁজাতীয় একটি বস্তু। নিঃশ্বাসের সঙ্গে শ্বাসনালিতে প্রবেশ করলে হাঁচি, কাশি ও সর্দি হয়। এর সংস্পর্শে এলে শরীরের কোষগুলো রি-অ্যাক্ট করে। এ পরিবেশে দীর্ঘদিন থাকলে ক্যান্সার হতে পারে। কোষগুলো অ্যাজবেসটকে মোকাবেলা করার জন্য তার সংখ্যা বৃদ্ধি ও অস্বাভাবিক কার্যকলাপ করতে থাকে। অ্যাজবেসটসকে মোকাবেলা করতে না পেরে একপর্যায়ে এ কোষগুলোই ক্যান্সারে পরিণত হয়। এছাড়া গর্ভবতী অবস্থায় এর সংস্পর্শে এলে মায়ের পাশাপাশি গর্ভের শিশুরও ক্ষতি হতে পারে। সেক্ষেত্রে কম ওজনের ও ত্রুটিপূর্ণ শিশু জন্ম নিতে পারে।

লেবার লাইনে অ্যাজবেসটসের ছাউনিযুক্ত ঘর । ছবি: ফিলিপ গাইন

সরেজমিন মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন চা বাগানে গিয়ে দেখা গেছে, কোনো কোনো বাগানে সারি সারি আবার কোনো কোনোটিতে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অ্যাজবেসটস ছাউনির ঘর। এগুলো সবাই বাদামি রঙের অ্যাজবেসটস। কোনো বাগানে ৫০ আবার কোনো বাগানে ৩০০টি পর্যন্ত অ্যাজবেসটসের ঘর রয়েছে। এ ঘরগুলোয় বাস করেন হাজার হাজার চা শ্রমিক।

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার চাতল-পুর চা বাগান ও মাধবপুর উপজেলার দলই চা বাগানে সারিবদ্ধভাবে শত শত অ্যাজবেসটসের ছাউনির ঘর রয়েছে। আর বিক্ষিপ্তভাবে অ্যাজবেসটস ছাউনির ঘর রয়েছে হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার রশিদপুর চা বাগানে। অনেক বাগানেই রয়েছেন ক্যান্সার রোগী। এরই মধ্যে মারাও গেছেন অনেকে। তবে কেউ বলতে পারেন না, কেন তাদের ক্যান্সার হয়েছিল।

উল্লেখ্য, দেশের মোট ১৬৬টি চা বাগানের মধ্যে ১১৫টির অবস্থানই মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায়। মৌলভীবাজারে ৯২ ও হবিগঞ্জে ২৩টি বাগান রয়েছে।

শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত বিষয়ে বাগান কর্তৃপক্ষ সচেতন রয়েছে বলে জানান দলই চা বাগানের ব্যবস্থাপক বাবুল সরকার। তিনি বলেন, বেশকিছু ঘরে অ্যাজবেসটস রয়ে গেছে। এগুলো অনেক আগে লাগানো। এখন আর অ্যাজবেসটস দেয়া হচ্ছে না। আর বাগানগুলো থেকে সব অ্যাজবেসটস তুলে ফেলা হবে।

এক ধরনের বিচ্ছিন্ন জীবনযাপনের জন্য অনেক শ্রমিকই জানেন না, অ্যাজবেসটসে ক্যান্সারের ঝুঁকি রয়েছে। আর মালিকরাও শ্রমিকদেরকে বিষয়টি জানতে দেন না।

হবিগঞ্জে ফিনলের মালিকানাধীন রশিদপুরের একটি চা বাগানের শ্রমিক আসুক মিয়া বলেন, শীতকালে 'ডাডেশ' (অ্যাজবেসটস) চুইয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে। এ পানি পিচ রঙের মতো হয়। কোনো জামাকাপড়ে লাগলে আর সে দাগ ওঠে না। তবে এতে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় কিনা, তা জানা নেই।

চা শিল্পের বিভিন্ন বিষয় দেখভালের দায়িত্ব বাংলাদেশ চা বোর্ডের। চা বোর্ডের প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট ইউনিটের (পিডিইউ) পরিচালক হারুন-অর-রশীদ বলেন, 'আমরা অ্যাজবেসটস ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করছি। সরকারের মালিকানাধীন বাগানগুলো থেকে অ্যাজবেসটস তুলে নেয়া হয়েছে। বেসরকারি মালিকানাধীন বাগানগুলোয় তা কিছু রয়ে গেছে। এগুলো যাতে তুলে নেয়া হয়, সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া হবে।'

জানা গেছে, জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় নিউজিল্যান্ড ১৯৮৪ সালে নীল ও ২০০২ সালে বাদামি রঙের অ্যাজবেসটস ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৬৭ সাল থেকে নীল ও ১৯৮৯ সাল থেকে বাদামি অ্যাজবেসটস নিষিদ্ধ করা হয়। এছাড়া জাপান ২০০৪, কোরিয়া ২০০৯, সিঙ্গাপুর ১৯৮৯ ও তুরস্ক ২০১১ সালে যে কোনো ধরনের অ্যাজবেসটস ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

পশ্চিমা দেশসমূহে অ্যাজবেসটস নিষিদ্ধ:
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)-এর

২০১৪ সালের তথ্য অনুসারে, "বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর ১২ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ কর্মক্ষেত্রে অ্যাজবেসটসের সংস্পর্শে আসছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) মতে প্রতিবছর এক লক্ষ শ্রমিক অ্যাজবেসটসজনিত রোগে মারা যায়।" সত্তরের দশকের শুরু থেকে পঞ্চাশ-টির বেশি দেশ অ্যাজবেসটসের ব্যবহার নিষিদ্ধ অথবা সীমিত করেছে। অন্যান্য দেশে অ্যাজবেসটসের ব্যবহার এখনো বিতর্কিত। ❑

আবদুল্লাহ আল মাহ্দী। প্রথম প্রকাশিত *বণিক বার্তা*, ২৫ অক্টোবর ২০১৪। ওয়েবসূত্র থেকে তথ্য নিয়ে হালনাগাদ করা হয়েছে।

রাজশাহীতে আদিবাসী হত্যা ও নারী নির্যাতন: নেপথ্যে ভূমি বিরোধ

উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের উপর ধারাবাহিকভাবে সংগঠিত হামলা, হত্যা এবং শারিরীক নির্যাতনের মত ঘটনা সবাইকে হতবাক করে। এ সকল নৃশংসতার মূল কারণ আদিবাসীদের ভূমি দখল। সম্প্রতি দিনাজপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে আদিবাসীদের উপর বর্বরোচিত হামলা নিয়ে ফিলিপ গাইনের সাথে রাজীবুল হাসানের প্রতিবেদন।

দিনাজপুরে সান্তাল কৃষক হত্যা

বাবা (ফাগু সরেন) ও বড় ভাই (গোসাই সরেন) গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছিলেন। এবার ঢুডু সরেন নিজে খুন হলেন। ২ আগস্ট ২০১৪ দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার কচুয়া গ্রামের সান্তাল কৃষক ঢুডু সরেনকে (৬০) দিবালোকে হত্যা করে একই গ্রামের আবদুল গাফ্ফার আলী (৪৫), তার তিন ভাই ও পরিবারের অন্য সদস্যরা। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ঢুডুর ২.৭৫ একর জমির অবৈধ দখল বজায় রাখতেই তারা এই বর্বর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ।

সকাল সাড়ে নয়টার দিকে ঢুডু ও সোলাইমান আলী (৪৮) পার্শ্ববর্তী হিলিরডাঙ্গা বাজার থেকে ফিরছিলেন। তারা যখন গাফ্ফারের বাড়ি অতিক্রম করছিলেন তখন ঢুডুর উপর নৃশংস হামলা করে আবদুল গাফ্ফার ও তার পরিবারের সদস্যরা।

"আবদুল গাফ্ফার ও তার ভাই আজহার আলী (৫০) ঢুডুকে বাইসাইকেল থেকে মাটিতে ফেলে মারতে শুরু করে। এক পর্যায়ে গাফ্ফারের তিন ভাই ও পরিবারের অন্য সদস্যরা ঢুডুকে বটি, কুড়াল ও ধারালো ছুরি দিয়ে কোপাতে থাকে। একই সাথে তারা ঢুডুকে লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে পেটায়," বলছিলেন সোলাইমান আলী।

গ্রামের সান্তাল ও বাঙালিরা গাফ্ফারের বাড়ির পাশের জমি থেকে ঢুডুকে উদ্ধার করে। "আমরা যখন বাবাকে উদ্ধার করি তখন তার জ্ঞান ছিল না। তার সমস্ত শরীর রক্তাক্ত ছিল। তার ডান হাত ও ডান পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তার ডান পায়ের রগ কেটে দেওয়ায় প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল," বলছিলেন ঢুডুর বড় ছেলে রবি সরেন (২৩)। গুরুতর আহত অবস্থায় বিকাল ৩ টার দিকে রংপুর সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে ঢুডুর মৃত্যু হয়।

ঘটনার পর পলাতক আবদুল গাফ্ফার আলী মুঠোফোনে দাবি করেন, "আমার বাবা মৃত গুলজার হোসাইন ঢুডুর দাদি নিগলো হাজদার কাছ থেকে ২.৭৫ একর জমি কিনেছিলেন। কিন্তু ঢুডু সেই জমি অন্য লোকের কাছে বিক্রি করে। গতকাল (২ আগস্ট ২০১৪) জমির দখল নিতে গেলে ঢুডু ও সান্তাল লোকজন আমাদের তীর, ধনুক ও লাঠিসোটা নিয়ে বাঁধা দিলে দু-পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের এক পর্যায়ে ঢুডু মারা যায়।"

ঢুডু সরেনের পরিবার। ছবি: প্রসাদ সরকার

রবি বলেন, "এ বিবাদ দীর্ঘদিনের। ১৯৭১ সালে গাফ্ফারের বাবা জাল দলিলের মাধ্যমে আমাদের জমি দখল করে। ২০০৮ সালে বাবা (ঢুডু সরেন) দিনাজপুরের অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের (রাজস্ব) আদালতে মামলা করে এবং ২০১০ সালে কোর্ট আমাদের পক্ষে রায় দেয়। আর তখন থেকেই গাফ্ফার ও তার ভাইয়েরা বাবাকে হত্যার হুমকি দিয়ে আসছিল।"

রবির ধারণা, তার দাদা ও চাচার হত্যাকাণ্ডের সাথেও গাফ্ফারের পরিবার জড়িত ছিল। রবি দাবি করেন, "আমার বাবা বা বাবার দাদি কখনই এই জমি গাফ্ফারের বাবার কাছে বিক্রি করেনি। আমাদের কাছে জমির মূল দলিল আছে।"

জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, "ঢুডুর বাবা ও বড় ভাইয়ের হত্যার সাথে গাফ্ফারের পরিবারের জড়িত থাকার বিষয়টি অসম্ভব নয়।" ঐ এলাকায় আদিবাসীদের ৩৩ একর ভূমির অবৈধ দখল সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলা রয়েছে বলেও তিনি জানান।

ঢুডুকে বিরোধপূর্ণ জমির প্রকৃত মালিক উল্লেখ করে ৯ নং কুশদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আজিজুল হক (৬০) বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে গাফ্ফার অবৈধভাবে এই জমি দখল করে রেখেছে। আমি অনেকবার তাদেরকে জমির মালিকানা দাবির স্বপক্ষে প্রকৃত দলিল হাজির করতে বলেছি। প্রত্যেকবারই তারা জাল দলিল উপস্থাপন করেছে।"

বাবার হত্যার বিচার চেয়ে রবি সরেন নবাবগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। রবি জানান, হত্যাকারীরা মামলা তুলে নেওয়ার জন্য তার পরিবারের উপর চাপ প্রয়োগ করছে।

দিনাজপুর থানার গোয়েন্দা কর্মকর্তা রেদওয়ানুর রহিম ২৭ আগস্ট ২০১৫ জানান, "আমরা প্রধান আসামি গাফ্ফারকে ধরে জেলে পাঠিয়েছি এবং মামলার চার্জশীট জমা দিয়েছি। বিষয়টি এখন আদালত দেখছে।"

রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, "মামলা চলছে। গাফ্ফার হাজতে আছেন। তিনি জামিন পাননি। হাওয়া বিবি জামিন পেয়েছেন এবং চার্জশীট থেকে তার নাম বাদ দেয়া হয়েছে। হাওয়ার চার্জশীট থেকে নাম বাদ পড়ার বিষয়টিকে নামঞ্জুর করে আদালতে আবেদন করেছে রবি সরেন।"

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ওঁরাও নারীর উপর হামলা ও ধর্ষণ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ওঁরাও নারী বিচিত্রা তিরকি (৩৪) বাঙালি ভূমিদস্যুদের হাত থেকে ১৯৭৮ সালে তার স্বামীর বেদখল হওয়া জমি ২০০৭ সালে উদ্ধার করেন। মংলা সরদারের (বিচিত্রার স্বামী) ৪৮ বিঘা (৩৩ শতকে এক বিঘা) জমি হাতছাড়া হওয়ায় মংলা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এবং ১৯৯৯ সালে তিনি মারা যান। পরিবারের ধারণা জমি হারানোর যন্ত্রণা তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল।

২০১৪-এর ৪ আগস্ট দুপুরে পার্বতীপুর ইউনিয়নের জিনারপুর গ্রামে বিচিত্রা প্রায় ২০ জনের একটি শ্রমিকদল নিয়ে নিজ জমিতে চাষাবাদ করতে গেলে চারপাশে ওত পেতে থাকা ভূমিদস্যুরা তার উপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা বিচিত্রাকে নির্মমভাবে পেটায় এবং তিনজন আক্রমণকারী তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

"মনিরুল ইসলাম মন্টু (৫০), আবদুল হামিদ (৬২), আফজাল হোসেন (৬০) এবং তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের নেতৃত্বে প্রায় ৫০ জনের একটি দল আমাদের জমিতে আসে। তারা শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করতে বলে। আমি তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে বাগবিতণ্ডা শুরু

ছবি: প্রসাদ সরকার

হাসপাতালে বিছানায় বিচিত্রা তিরকি।

হয়। এক পর্যায়ে একজন কোদালের হাতল দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করলে আমি মাটিতে পড়ে যাই। এরপর তারা আমাকে ঘিরে ধরে, পরনের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে এবং হাত, বুক, পা ও উরুতে কোদালের হাতল ও লাঠি দিয়ে নির্বিচারে পেটাতে থাকে।" গত ৬ আগস্ট হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে বিচিত্রা এভাবেই তার উপর আক্রমণের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। "এখানেই শেষ নয়। মন্টুর ছেলে রেজাউল করিম (২৭), শ্যালক আখতার হোসেন (৩৫) এবং মন্টুর সহযোগী আকবর আলি (২৫) আমাকে জমির এক পাশে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে," অভিযোগ বিচিত্রার।

বিচিত্রার বাবা যতিন কিসপট্টা (৬০) জানান, "তারা লাঠি দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করলে আমি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যাই। জ্ঞান ফিরে দেখি আমার মেয়ে উলঙ্গ অবস্থায় জমিতে পড়ে রয়েছে।"

বিচিত্রা ৪ আগস্ট থেকে ৩০ আগস্ট (২০১৪) পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। তিনি গোমস্তাপুর পুলিশ স্টেশনে ধর্ষণ ও লুটপাটের অভিযোগে একটি এবং শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগে আরেকটি মামলা দায়ের করেন।

গোমস্তাপুর থানার ওসি ফিরোজ আহমেদ মামলার সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে ২৭ আগস্ট ২০১৫ জানান, "বেশিরভাগ আসামি জামিন পেয়েছে। আমরা চার্জশীট জমা দিয়েছি। আদালতে মামলা চলছে।"

উত্তরাঞ্চলের আদিবাসীদের সংগঠন জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, "বাংলাদেশের আদিবাসীরা যে কতটা নিরাপত্তাহীন অবস্থায় বসবাস করছে বিচিত্রা তিরকির উপর হামলা তা আবার প্রমাণ করলো।"

বিচিত্রা বলেন, "মামলা ধীর গতিতে চলছে। আসামিরা গ্রেফতার হওয়ার কয়েকদিন পর গত রোজার ঈদের সময় (২০১৪) জামিন পেয়েছে। চলতি মৌসুমে আমি ঐ জমিতে আবাদ করেছি। কোনো সমস্যা হয়নি। তবে প্রায়ই আমাকে তারা হত্যার হুমকি দেয় এবং আমাকে দেখলে তারা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে।" ❑

চা বাগানে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল: আতঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ চা শ্রমিক

২০১৫ সালের ১০ এপ্রিল। হবিগঞ্জের চান্দপুর চা বাগানে ক্ষেতল্যান্ডের (চা বাগানের ভেতরকার কৃষিজমি) উপর বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মাঠে জড়ো হয়েছে কয়েকশ শ্রমিক। চান্দপুর চা বাগানের ৯৮৫ একর ক্ষেতল্যান্ডের মধ্যে ৫১১ একর জমিতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার কঠোর বিরোধী তারা। এই ক্ষেতল্যান্ড চান্দপুর চা বাগানের অন্তত ১,২০০ দরিদ্র শ্রমিক পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের ভয় বংশ পরম্পরায় যে জমি তারা চাষ করে আসছে, সরকারি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে সেই জমি হারিয়ে ফেলবে।

অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিষয়ে বাগান মালিক কর্তৃপক্ষ বা সরকার কেউই শ্রমিকদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি। চান্দপুর চা বাগানের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানান, তাদেরকেও সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। চা শ্রমিদের দাবি, সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের মতামত শুনুক। লস্করপুর ভ্যালির (বাংলাদেশের ১৫৭ টি চা বাগান ৭টি ভ্যালিতে বিভক্ত, যার মধ্যে লস্করপুর একটি) নির্বাচিত সভাপতি অভিরতি বাগতি বলেন, "উপ-কমিশনার, উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ইউএনও চা বাগানের বাইরে আমতলিতে বসে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং নিরাপত্তার অজুহাতে তারা বাগানে আসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।"

"চা শ্রমিকদের সাথে আলোচনার কিছু নেই। এই জমির মালিক সরকার। সরকার চাইলে যে কোনো সময় এ জমি ব্যবহার করতে পারে।" ৯ এপ্রিল ২০১৫ এভাবেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন হবিগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কাগজ পত্র ইতিমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি। অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সার্বিক দায়িত্ব বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বা বেজা'র।

অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো সৃষ্টির মাধ্যমে তৈরি হওয়া নতুন সুযোগ এবং উৎপাদন জাতীয় অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করতে সহায়তা করবে। বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ)-এর সাধারণ সম্পাদক রামভজন কৈরী বলেন, "শিল্পায়ন এবং এর মাধ্যমে সৃষ্ট উন্নয়নের বিরোধী নন চা শ্রমিকেরা। কিন্তু নিজেদের জীবিকার জন্য চা শ্রমিকরা যে ক্ষেতল্যান্ডের উপর নির্ভরশীল তা সরকার এভাবে নিয়ে নিতে পারে না।

চা উৎপাদনের জন্য জমি ইজারা দেয়ার সঙ্গে জড়িত এক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এবং সরকারের ভেতরকার অনেকেরই অভিমত, চা বাগানের ভেতরে বা ক্ষেতল্যান্ডে এ ধরনের অর্থনৈতিক অঞ্চল করার সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। ❑

ফিলিপ গাইন

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত ল্যান্ডে চা শ্রমিকদের জমায়েত। ছবি: ফিলিপ গাইন

“বাংলাদেশের চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তাসমূহের মানচিত্রায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি” প্রকল্পের অগ্রগতি

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইকো কোঅপারেশনের অর্থায়নে প্রকল্পটি শুরু হয় ২০১৩ সালের মে মাসে। প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) এবং পার্টনার গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)। গবেষণা, স্বল্প-পরিচিত জনগোষ্ঠীগুলোর মানচিত্রায়ন এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের মূল কাজ। প্রথম দুই বছরে পরিকল্পিত প্রায় সব কার্যক্রমই বাস্তবায়ন হয়েছে এবং তা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে।

জাতিসত্তাসূমহের মানচিত্রায়ন: চা শ্রমিক এবং এদের গোষ্ঠীসমূহ (প্রকল্পের মূল উপকারভোগীদের মধ্যে একটি অংশ) বাংলাদেশের অন্যতম প্রান্তিক ও উপেক্ষিত জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীগুলো খুবই বৈচিত্র্যময়; তবে আগে কখনোই সঠিকভাবে এদের মানচিত্রায়ন হয়নি। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি), সাক্ষাৎকার এবং তাদের নিয়ে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে এদের মানচিত্রায়ন করা হয়েছে। গবেষণা কর্মীরা ১৫৭ টি বাগানের সবগুলোতে এফজিডি পরিচালনা করেছে।

চা বাগানের জাতিগোষ্ঠীগুলো নিয়ে যে চিত্র পাওয়া গেছে তা অবাক করার মতো। সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভিবাজার, চট্টগ্রাম এবং রাঙামাটি জেলার ১৫৭ টি চা বাগানে প্রায় ৯০ টি জাতিসত্তার (আদিবাসী, নৃগোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী) খোঁজ পাওয়া গেছে। এই জাতিগোষ্ঠীগুলো হল: অলমিক, ওরাও, ওরিয়া, কন্দ, কর্মকার, কালওয়ার, কানু, কাহার, কালিন্দি, কৈরী, কুমার, কেওট, কোরা, কোল, খোদাল, খারিয়া, গয়েশ্বর, গন্ড/গঞ্জু, গরাইত, গোর, গারো, গুর্খা, গৌরি, গোস্বামী, গোয়ালা, গিরি, ঘাটুয়ার, চাষা, জৈন্তা পাত্র, জোরা, দুসাদ, নায়েক, নাইডু, নুনিয়া, তেলেগু, তংলা, চৌহান, ভোক্তা, লোহার, বানাই, বাউরি, বার্মা, বারাইক, বাশফোর, বাগতি, বাঙালি, বীন, বুনার্জি, বিহারি, ভূইয়া, ভূমিজ, ভর, ভুজপুরি, মৃধা, মাদ্রাজি, মারমা, মাল, মাহলে, মাহারা, মাঝি, মনিপুরি, মুশহর, মুন্ডা, রাউতিয়া, রাজব-ল্লভ, রাজবংশী, রাজভর, রাজঘর, রাজুয়ার, রবিদাস, শব্দকর, শবর, শীল, শুক্লবৌদ্ধ, সাদরি, সাধু, সান্তাল, হালাম, হাজরা, রিলে প্রমুখ।

মানচিত্রায়নের আরেকটি এলাকা দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তর-মধ্যাঞ্চলে বসবাস-কারী স্বল্প-পরিচিত ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহ। এই জাতিগোষ্ঠীগুলোর মানচিত্রায়নে একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ১৪টি জেলা এবং উত্তর-মধ্যাঞ্চলের ৫টি জেলার ১৪টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে সরকার যেখানে সেড পরিচালিত জরিপে অন্তত ৪৫টি স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তার খোঁজ পাওয়া গেছে। এই জাতিগোষ্ঠীগুলো হল: হাজং, কোচ, বানাই, ডালু, হদি, শবর, রাজবংশী/বংশী, গুর্খা, বাগতি, ভুইয়া, ভু-ইমালি, ভূমিজ, বিন্দু, চৌহান, ঘাটুয়াল/ঘাটুয়ার, গঞ্জু সিং, গরাইত, হো, হাজরা, হাড়ি, হদি, কদর, কৈরী, কালোয়ার, রাই বর্মন (ক্ষত্রিয়), কোদা, কোরা, কর্মকার, কোল, মুন্ডা, পাহাড়িয়া, কুর্মি, মদক, মাহালি/মাহালে, লোহার, মালো, মুশহর, নুনিয়া, পাহান, পাল, তেলি, রবিদাস, রাজভোর, রাজোয়ার, তাঁতি/তন্তবাই, তেলেগু, তেলি, তুরি ইত্যাদি।

অনুসন্ধান: চূড়ান্ত উপকারভোগীদের মানবাধিকার কতটুকু সংরক্ষিত হচ্ছে তা বোঝার জন্য প্রকল্পের অন্যতম কার্যক্রম অনুসন্ধান। প্রকল্পের কর্মী, সহযোগী সংগঠন, চূড়ান্ত উপকারভোগী, ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী এবং সাংবাদিকদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় অনুসন্ধানী কার্যক্রম চালানো হয়েছে। দুই বছরের মধ্যে চালানো অনুসন্ধানসমূহের অন্যতম: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিবদাপূর্ণ জমি নিয়ে ঘটা হত্যাকান্ড, অগ্নিসংযোগ, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের ঘরবাড়ি ভাংচুর, নারী ও পুরুষদের উপর শারিরীক নির্যাতন; চা শ্রমিকদের উপর আক্রমণ; চা বাগানের শিক্ষা ব্যবস্থা; চা বাগানের ক্ষেত ল্যান্ড বা আবাদী জমিতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সরকারি সিদ্ধান্ত; দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তা ও চা শ্রমিকদের জীবন সংগ্রাম; চা বাগানে অ্যাজবেসটস-এর ব্যবহার; চা বাগানে রাবার চাষ এবং তার কুফল; ভূমি কেড়ে নেয়া; বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন, প্রভৃতি।

বিভিন্ন কার্যক্রম, মানচিত্রায়নের কাজ, অনুসন্ধানী কার্যক্রম, গবেষণা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাওয়া বিভিন্ন প্রতিবেদন, তথ্য এবং ফলাফল নিয়ে বই প্রকাশিত হবে।

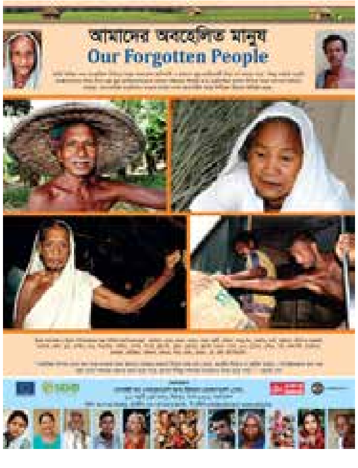

দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম: চূড়ান্ত উপকারভোগী, উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী এবং প্রকল্পের অংশীদারদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা এবং সংলাপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের দুই বছরের মধ্যে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও চা জনগোষ্ঠীদের মানবাধিকার, মানচিত্রায়ন, পরিচিতি ও সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করা পেশাজীবিদের দক্ষতা আরো বাড়ানোর জন্য পাঁচটি আবাসিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চা শিল্পের শ্রমিক নেতা এবং অন্যান্য অঞ্চলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হয়েছে।

প্রকল্পের শেষ বর্ষের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি

সংলাপ: "চা শ্রমিক ও তাদের গোষ্ঠীগুলোর মানচিত্র, পরিচয় ও অধিকার বিষয়ে পুনর্ভাবনা" শীর্ষক সংলাপ; ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীমঙ্গলে।

প্রশিক্ষণ কর্মশালা: ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকল্পের সকল উপকারভোগীসহ টার্গেট জনগোষ্ঠীর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে চূড়ান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

কনভেনশন: ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে উপকারভোগীসহ টার্গেট জনগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে জাতীয় কনভেনশন। এই কনভেনশনে প্রকল্পের ফলাফল উপস্থাপনসহ থাকবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলের পরিবেশনা। এটি একই সঙ্গে একটি এ্যাডভোকেসি এবং চূড়ান্ত উপকারভোগীদের অধিকার বিষয়ে একটি শিক্ষামূলক কার্যক্রম।

আলোকচিত্র প্রদর্শনী: প্রকল্পের শেষ বর্ষে দুটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর—চা শ্রমিকদের নিয়ে একটি ও স্বল্প-পরিচিত জাতিগোষ্ঠীগুলোকে নিয়ে একটি (একটি আয়োজন করা হবে কনভেনশনের সাথে আর অন্যটি করা হবে আলাদাভাবে)। আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে উপস্থাপন করা ছবিগুলোর মধ্য দিয়ে চা শ্রমিক এবং স্বল্প-পরিচিত জাতিগোষ্ঠীসমূহের পরিচয়, জীবন, সংস্কৃতি ও সংগ্রাম ফুটিয়ে তোলা হবে। ❑

চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তাসমূহের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক এজেন্ডা

এটি চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তাসমূহের একটি রাজনৈতিক ইশতেহার। এতে চা জনগোষ্ঠী ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তাসমূহের পরিসংখ্যানগত ও ভৌগলিক অবস্থানের উপর খানিকটা আলোকপাতের পাশাপাশি তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, কাঠামোগত মানবাধিকার লঙ্ঘন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও অধিকার নিয়ে নানা সুপারিশ করা হয়েছে। দলিলটি তৈরি করেছেন চা জনগোষ্ঠী ও আদিবাসীদের প্রতিনিধিরাই।

এজেন্ডায় আদিবাসী ও চা জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সুরক্ষার বিষয়টি স্থান পেয়েছে সর্বাগ্রে। চা বাগানগুলোতে সরকারি, বাগান পরিচালিত এবং কিছু এনজিও পরিচালিত স্কুল রয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষকসহ শিক্ষার উপকরণ নেই। শ্রমিকরা দরিদ্র হওয়ায় সন্তানদের শিক্ষার খরচ চালাতে পারে না। তাই তাদের পর্যাপ্ত শিক্ষার সুযোগ দেয়ার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়েছে।

নিম্নমানের ও অপর্যাপ্ত বাসস্থান, বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকট, অপুষ্টি এবং অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থা চা শ্রমিকদের আবাসস্থল লেবারলাইনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এছাড়া যক্ষা, কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া, রক্তশূন্যতা ইত্যাদি তাদের নিত্যসাথী। এ বিষয়ে তদারকি ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে এজেন্ডায়।

চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিগোষ্ঠীসমূহ নিয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আইন ও সনদে যেসব অধিকারের কথা বলা হয়েছে সেসবের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে এজেন্ডায়। মজুরি, ছুটি, ঝুঁকিভাতা, শোভন কর্মপরিবেশ ইত্যাদি চা শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার। কিন্তু এগুলোতেও তারা বৈষম্যের

শিকার। এ বৈষম্য প্রতিরোধে এজেন্ডায় কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। ভূমি ও সম্পদে অধিকারের বিষয়টি বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে এজেন্ডায়। তাদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে সুপারিশ করা হয়েছে।

অবহেলিত এ প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে নারী ও শিশু আরো প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে। তাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সুরক্ষার বিষয়গুলোতে বিশেষ নজর দেয়ার কথা বলা হয়েছে। বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়গুলোও এখানে উঠে এসেছে। এছাড়া নীতিমালা প্রণয়ন ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং প্রতিনিধিত্ব করতে এ জনগোষ্ঠীকে বিশেষ সুযোগ দানের কথা এজেন্ডায় যুক্তিসঙ্গভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এজেন্ডায় চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা কীভাবে গভীর রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক সমস্যায় জর্জরিত তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। কয়েক প্রজন্ম ধরে মজুরি বঞ্চনা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় বঞ্চনার শিকার এসব মানুষ শুধু যে দরিদ্র তাই নয়, এরা সুবিধা বঞ্চিত বিশেষ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। এদেরকে শুধু দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিবেচনা করলে তারা যে গভীর সমস্যায় ডুবে আছে তার থেকে পরিত্রানের উপায় নেই। সুবিধা বঞ্চনার পাশাপাশি এরা স্থানীয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্পৃশ্য বিবেচনায় এদেরকে দূরে রাখা হয়। চা জনগোষ্ঠীর একটি বড় সমস্যা হলো এরা সাধারণ চা বাগানের বাইরের কর্মজগত ও পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত নয়। এ কারণে এদের প্রতি রাষ্ট্রের বাড়তি নজর ও সুবিধা দেওয়া জরুরি। এজন্য রাষ্ট্রের বিশেষ নীতি, পরিকল্পনা ও সুনির্দিষ্ট সেবা দেয়ার অঙ্গীকার থাকা দরকার। পাশাপাশি দেশের রাজনৈতিক দলসমূহের করণীয় অনেক। এদেরকে শুধু ভোটব্যাংক হিসাবে বিবেচনা না করে রাজনীতিতে সত্যিকারের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া অত্যন্ত জরুরি। অতীতে যেসব অঙ্গীকার রাজনৈতিক দলসমূহ করেছে সেসব পর্যালোচনা যেমন করা উচিত তেমনি নির্বাচনে এদের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। দেশের বিবেকবান মানুষ এবং সুশীল সমাজেরও কর্তব্য এদের প্রতি রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্রের অঙ্গীকার ও দায়িত্ব পালনে সার্বিক সহযোগিতা দেয়া। ❑